ব্রিফিং নোট

মার্চ ২০২৪

৩

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

Funded by the European Union

Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ, জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। যার ফলাফল উপস্থাপনের লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সহযোগিতায় স্থানীয় সমাজের নানা অংশীজনদের নিয়ে ২০২৩ সালের ১০ জুন গাইবান্ধা জেলায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি: আমাদের করণীয়" শীর্ষক নাগরিক সংলাপ এর আয়োজন করে। সংলাপে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষা উদ্যোক্তা, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

cpd.org.bd

cpd.org.bd

cpdbangladesh

CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি

ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩

ই-মেইল: info@cpd.org.bd

মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে

প্রারম্ভিক বক্তব্য

প্রারম্ভিক বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, মানসম্মত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একটি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, গবেষণায় যেসব বিষয় উঠে আসা দরকার ছিল, সেগুলো সঠিকভাবে উঠে এসেছে কি না, তা মূল্যায়ন করাই এ আয়োজনের লক্ষ্য। আর গবেষণায় যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো সমাধানের বিষয়ে কীভাবে এগোনো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি জানান, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ যেমন রয়েছে, তেমনি শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি প্রভৃতি কাঠামো রয়েছে। তা সত্ত্বেও কী কারণে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না, সে বিষয়টি অনুসন্ধান করা আজকের আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদারে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থানীয় অংশীজনরা বলেন, গবেষণায় বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার বিষয়টি উঠে আসেনি। বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া উচিত। এছাড়া বিদ্যালয়ে সাঁতার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প কাজে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বক্তারা জানান, অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই, যা শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশের অনেক স্কুলে বাউন্ডারি দেওয়া নেই। এতে করে শিক্ষার্থীদের সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সব বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি নির্মাণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিয়ে আনতে হবে

এলাকায় নতুন কর্মকর্তা আসলে তিনি বিভিন্ন নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। এসব ব্যবস্থা যখন সফলতার দিকে ধাবিত হয়, তখনই দেখা যায় সেই কর্মকর্তা বদলি হয়ে যান। নতুন কর্মকর্তা এসে আবার নতুন ধরনের ব্যবস্থা চালু করেন। এভাবে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার কারণে কোনো কিছুই টেকসইভাবে বাস্তবায়িত হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের কার্যত কোনো উপকার হয় না।

বরাদ্দের অর্থ তুলতে ঘুষ দিতে হয়

বক্তারা উল্লেখ করেন, বিদ্যালয়ের মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ছয় মাসে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরমধ্যে পাঁচ হাজার টাকা ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ কেটে রাখা হয়। বাকি অর্থ ছাড় করানোর জন্য শিক্ষা অফিসকে নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়। আর এসব দাপ্তরিক কাজ করার জন্য প্রধান শিক্ষককে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। সেজন্য তিনি বিদ্যালয়ে সময় দিতে পারেন না। এজন্য অন্য শিক্ষকদের মনিটরিং করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার মান নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছে। এসব কাজে সহায়তার জন্য বিদ্যালয়ে একজন অফিস সহকারী নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য যেসব উপকরণ ক্রয় করতে হয়, সেটি উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেন এবং তারা নিজেদের মতো করে বিল-ভাউচার তৈরি করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এভাবে কেনাকাটায় দুর্নীতি হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যে উপকরণটি প্রয়োজন, সেটি বিদ্যালয় পাচ্ছে না।

আদিবাসী ও দলিতদের জন্য পৃথক উদ্যোগ নিতে হবে

গবেষণায় সমতলের আদিবাসীদের সন্তানদের পড়ালেখার বিষয় উঠে আসেনি। কারণ আদিবাসীদের সন্তানরা সাধারণদের তুলনায় অধিক বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে ভাষাগত ভিন্নতার কারণে তারা সমস্যায় পড়ে। এ কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই তারা ঝরে পড়ে। বক্তারা আরও বলেন, বিদ্যালয়ে রবিদাস সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বৈষম্যের শিকার। অন্য সাধারণ ছেলেমেয়েরা রবিদাস সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে চায় না। সে কারণে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। এমনকি অনেক স্কুলে তাদের ভর্তিও করতে চায় না। এ সমস্যা শহরে কমে আসলেও গ্রামাঞ্চলে এখনো বিদ্যমান। কোন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী বেশি ঝরে পড়ছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এজন্য আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দলিতদের জন্য পৃথক উদ্যোগ নিতে হবে। আরেক বক্তা বলেন, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩ বছর আগে। এখন পর্যন্ত সে বিদ্যালয়ে সরকারি কোনো সহায়তা পৌঁছেনি। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের এক্ষেত্রে মনোযোগ নেই বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন।

শতভাগ পাস নয়, নজর দিতে হবে গুণগত শিক্ষায়

বক্তারা বলেন, সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের রাখা হয়। এতে তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষুধার্ত থাকে। এ সময় ৩টা পর্যন্ত নামিয়ে আনা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠে আরও মনোযোগী হবে। ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। তারা উল্লেখ করেন, শিক্ষকরা শতভাগ পাস করানোর বিষয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীদের নম্বর বাড়িয়ে দেন। এতে তারা পাস করে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে আর টিকতে পারে না। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষায় যে বাড়তি সময় দেওয়া হয়, তা যথেষ্ট নয়, এটি বাড়ানো প্রয়োজন।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার মডেল

আলোচকরা বলেন, বাংলাদেশের সব অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। ফলে সমধর্মী শিক্ষা অবকাঠামো ও সমধর্মী শিক্ষা কারিকুলাম সব অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আর্থিকভাবে সচ্ছল একটি অঞ্চলে যে প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব, চরম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে সেভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। একইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব যেখানে কম সেই স্থান আর নদীভাঙন-প্রবণ ও চরাঞ্চলের বাস্তবতা এক নয়। অনুরূপভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের বাস্তবতা সমতলের সঙ্গে মিলবে না। হাওর ও চলনবিলের বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্নতর। সারাদেশে ভাষার ক্ষেত্রে অনেকটা অভিন্নতা থাকলেও ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে নানামাত্রিক ভিন্নতা রয়েছে। এসব ভিন্নতা বিবেচনায় রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন অংশগ্রহণ-কারীরা। এ বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যরিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, একটি বিদ্যালয়ের নানা ধরনের অসুবিধা থাকতে পারে। চরাঞ্চলের বিদ্যালয়ের কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা রয়েছে অন্যদিকে নদী পারাপারের এলাকায় আরেক ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। স্কুল ভবন কোন স্থানে অবস্থিত তার ওপর ভিত্তি করে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। এসব এলাকাভত্তিক নানা সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি পদক্ষেপ থাকতে হবে।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন অনেক

বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো (র‌্যাম্প) স্থাপিত হয়নি। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো স্থাপন করারওপর তাগিদ দিতে হবে।

গাইবান্ধার এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. অনামিকা সাহা বলেন, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকতে হয়। মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ২০১৪ সালের এক জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, মাত্র তিন শতাংশ বিদ্যালয়ে স্যানিটারি বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে। মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ হতে পারে। এটির ফলশ্রুতিতে হয়তো বাল্যবিবাহ বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষায় সংকট তৈরি করছে কোচিং সেন্টার ও কিন্ডারগার্টেন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোচিং সেন্টার ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে। বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন কেবল দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিজেদের স্কুলে না পড়িয়ে এসব কোচিং সেন্টারে পাঠাচ্ছেন। এতে করে বিদ্যালয়ে পাঠদানের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামের কিছুটা অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কিন্ডারগার্টেন বা কোচিং সেন্টারে পড়াচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই এসব কোচিং বাণিজ্য ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর উদ্যোক্তা। ফলে যেসব অভিভাবকের সামর্থ্য নেই, কেবল তাদের ছেলেমেয়েরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আবার দরিদ্র পরিবারের শিশু হওয়ায় তাদের অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে হয়। এর ফলে শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। এক্ষেত্রে উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হলে তা প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

এ বিষয়ে সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আবদুর রশিদ রেজা সরকার ডাবলু বলেন, অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেমেয়েকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠানোর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ আগে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ছিল না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা অনেক বেশি। এসব স্কুল যারা পরিচালনা করেন, তারা বইয়ের দোকানের সঙ্গে চুক্তি করে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বইয়ের দোকান থেকে বই কিনতে বাধ্য করেন এবং এর মাধ্যমে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হন। আর বাড়তি বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে শিশুরাও অনেক বেশি চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

চরাঞ্চলের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ জরুরি

বক্তারা উল্লেখ করেন, গাইবান্ধায় কয়েকশত চর রয়েছে। এসব চরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোয় শিক্ষক থাকেন না। তাছাড়া এ অঞ্চলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় বন্যা হয়। ওই সময়ে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করতে পারে না। ফলে তাদের লার্নিং লস বা শিখন ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি পোষাতে পরবর্তীতে বাড়তি ক্লাস বা অন্য কোনো উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। তাছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয় গুলোয় যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান, তারা সেখানে যেতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে বদলি শিক্ষক (প্রক্সি টিচার) দিয়ে পাঠদান করা হয়। এতে গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় শিক্ষার্থীরা। এক্ষেত্রে চরাঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক নিয়োগবিধি প্রণয়নের তাগিদ দেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি। তিনি বলেন, ‘চরাঞ্চলের বাস্তবতা সমতলের মতো নয়। কাজেই চরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া উচিত। সেসব শর্ত মেনে যদি কেউ আবেদন করেন, তাহলে তাদের নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো শিক্ষককে অবশ্যই বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় অবস্থান করতে হবে। সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে । দুর্গম চরাঞ্চলে যেহেতু কেউ থাকতে চায় না, সে ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতায় কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি দুর্গম এসব এলাকার শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।’ তিনি আঞ্চলিক বাস্তবতার নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষার মডেল নির্ধারণের ওপর জোর দেন এবং চর উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।

এ বিষয়ে ইএসডিওর জেনারেল কমিটির সদস্য আখতারুজ্জামান বলেন, প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় পোস্টিং পাওয়া শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যান না। তারা প্রক্সি শিক্ষকের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রক্সি শিক্ষককে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক মাসে মাসে হয়তো দু-তিন হাজার টাকার মতো ধরিয়ে দেন। তার বিনিময়ে তারা ওই শিক্ষকের পক্ষে প্রক্সি শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন। এ বিষয়টি বন্ধ করতে হলে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ে পাঠাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে

আলোচনায় বক্তারা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০ বই সংবলিত একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের বিধান রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য সরকারি কোনো বরাদ্দ নেই। এমনকি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কোনো পদ নেই। আলোচকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ছাড়করণ পদ্ধতি সহজীকরণের পরামর্শ দেন।

এ বিষয়ে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি বলেন, লাইব্রেরির জন্য ৫০০ বই রাখার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এ খাতে সরকারের তরফ থেকে কোনো বরাদ্দ নেই। এমনকি বিদ্যালয় ভবনের নকশায় গ্রন্থাগার জন্য পৃথক কক্ষের বিষয়টিও উল্লেখ নেই। তাছাড়া বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কোনো পদও নেই। তাহলে গ্রন্থাগার হবে কীভাবে?

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক করতে হবে

বক্তারা জানান, শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকায় একজন শিক্ষককে অনেক বেশি শ্রেণিতে পাঠদান করতে হয়। তাছাড়া ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক বেশি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৪ জন থেকে কমিয়ে ৩০ জনে নামিয়ে আনার পরামর্শ দেন বক্তারা। বিদ্যালয় অবকাঠামোর নানা ত্রুটিও উঠে আসে গবেষণা ফলাফলে। জানানো হয়, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা এবং একজন শ্রেণি-শিক্ষকের জন্য যথাযথভাবে ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যে সাধারণ অবকাঠামো, সেখানে ওই সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথভাবে আসন বিন্যাস এবং শিক্ষা-সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যায় না। বিদ্যালয়ে গড় শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ৫.৩ টি। ৫ টির বেশি এবং ৫ টির কম শ্রেণিকক্ষ রয়েছে ২ টি বিদ্যালয়ে এবং ৫টির বেশি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে ৪ টি বিদ্যালয়ে। শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা যেসব বিদ্যালয়ে রয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের বসানোর জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দুই-শিফটে ক্লাস করানো হয়। কিন্তু তারপরও প্রতিটি শ্রেণিতে বা বিভাগে (ক-বিভাগ, খ-বিভাগ ইত্যাদি) গড় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭০ জনের মতো। বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকের গড় সংখ্যা ৬ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় এখনো সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষকদের খালি গলায় কথা বলতে হয়, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যে কার্যকর শিখন যোগাযোগ তৈরি করা কঠিন করে তোলে। যদিও এখন প্রায় সব বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে ফ্যান চালানোর ব্যবস্থা রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অপর্যাপ্ত এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং বিশেষ করে গরমের সময় এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর পক্ষে শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী থাকা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

মিড-ডে মিল চালুকরণ

আলোচকরা জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে পুষ্টির অভাব। কারণ এসব বিদ্যালয়ে দরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে। আর সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তারা বলেছেন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তেমনি শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হারও কমবে। পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণের পাশাপাশি দরিদ্রতার কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসতে মিড-ডে মিলের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। গবেষণা জরিপেও বিষয়টি উঠে এসেছে।

দারিদ্র্যের কারণে বাড়ছে বাল্যবিবাহ ও ঝরে পড়া

গবেষণায় উঠে এসেছে, গাইবান্ধা জেলায় বাল্যবিবাহের হার বেশি। এর পেছনের কারণ হিসেবে প্রধানত দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেন সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা। এ বিষয়ে তারা বলেন, জেলার অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের। সে কারণে তারা মেয়েদের পাত্রস্থ করার বিষয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। এমন ধারণা থেকে মেয়েকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন।

এ বিষয়ে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি বলেন, বাল্যবিবাহ একটি বড় সমস্যা। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, বাল্যবিবাহ কেন হচ্ছে? তাহলে উত্তর আসবে, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি, তাই বাল্যবিবাহের হার বেশি। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, ঝরে পড়ার হার কেন বেশি? তাহলে উত্তর আসবে, বাল্যবিবাহের হার বেশি, তাই ঝরে পড়ার হারও বেশি। এ দুটি বিষয় খুবই আন্তঃসংযুক্ত। এ বিষয়টি মোকাবিলায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। যেসবশিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষকদের এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এর পাশাপাশি সমাজের সব ধরনের অংশীজনের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ রোধে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে কেবল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে না।

সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থাকরণ নিশ্চিত করতে হবে

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি সাধারণ চিত্র। বাথরুমের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বাথরুম পরিষ্কার করার সামগ্রীর সরবরাহ যথেষ্ট নয়। শিশুদের পানি পানের জন্য টিউবওয়েলের ব্যবহার অসুবিধাজনক। পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না, তা দেখতে হবে। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি দেয়াল তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদ নেই। পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প তৈরি করতে হবে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে শিখন কার্যক্রমের নিম্নমান এবং প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে না পারার কারণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে টিউশনি করার চাপ অনেকেই বোধ করেন।

শিক্ষা কার্যক্রম তদারকিতে দুর্বলতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

বক্তারা উল্লেখ করেন, শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবক প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষা মৌসুমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে চলেছে। শিক্ষা কার্যক্রম, শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক প্রতিনিধি, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং নারীদের অংশগ্রহণের অনুপাত বাড়ানো প্রয়োজন।

এ বিষয়ে ড. অনামিকা সাহা বলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মান অনেক ক্ষেত্রে ভালো হয়। এর কারণ হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা ও মনিটরিংয়ের ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, ৩০ শতাংশ শিক্ষক সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে উদাসীন। শিক্ষকদের জবাবদিহিতা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। বিভিন্ন মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ই তার প্রমাণ। দেশের নানা সমস্যার মধ্যে কিছু বিদ্যালয় এভাবেই ভালো করছে। প্রধান শিক্ষকের একক প্রচেষ্টায় এটা করা সম্ভব নয়। অনেক সময় উচ্চপর্যায়ের সরকারি দপ্তর থেকে প্রধান শিক্ষকদের ওপর কাজের জন্য চাপ দেওয়া হয়। এ থেকে শিক্ষকদের নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।

তিনি উল্লেখ করেন, একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে একটি প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু এখনো সেটির কোনো বাস্তবায়ন নেই। দেশে বর্তমানে প্রায় ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যমান। এছাড়া পথশিশু, আদিবাসী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু -তাদের শিক্ষামুখী করা এখনো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

এ বিষয়ে আখতারুজ্জামান মনে করেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার করা হয়েছে। সেই ক্লাস্টারে একজন এটিইও দায়িত্ব পালন করেন। কাজেই সেখানে শিক্ষা আরও ভালো হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে মনিটরিংটা সঠিকভাবে করতে হবে। একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকই প্রধান মনিটর, কারণ তিনি সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যালয়ে থাকেন। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সঙ্গে নানা সময় জটিলতা দেখা দেয়। সেগুলোও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি বলেন, বিদ্যালয় মনিটরিংয়ের জন্য অনেকে সিসিটিভির কথা বলেছেন। আমি মনে করি, একজন ব্যক্তির দায়বদ্ধতা তার নিজ থেকে আসতে হয়। নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে খুব বেশি দায়বদ্ধতা আনা সম্ভব নয়। তবে সিসিটিভি স্থাপনের কিছু উদাহরণ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শিক্ষকদের বণ্টন ব্যবস্থায় দক্ষতা আনতে হবে

বক্তারা বলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক বণ্টনে বৈষম্য রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। আবার অনেক বিদ্যালয়ে মাত্র ৩ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর ফলে কম শিক্ষক নিয়ে চলা বিদ্যালয়গুলো সমস্যায় পড়ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পদায়নের সময় বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক বিভিন্ন শ্রমে নিযুক্ত করা হচ্ছে । এ কাজে শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা জড়িত। এসব বিষয় বন্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সাক্ষরতার হারে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে গাইবান্ধা

সচেতন নাগরিক কমিটির গাইবান্ধা জেলা কমিটির সভাপতি জহুরুল কাইয়ুম বলেন, গাইবান্ধা দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর একটি। অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। আর বৈষম্যের তীব্রতা আমরা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন সরকারি বিদ্যালয়ে কেবল দরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েরাই পড়ে। তিনি উল্লেখ করেন, সাক্ষরতার হারে গাইবান্ধা পিছিয়ে রয়েছে। জাতীয়ভাবে সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬ শতাংশ হলেও গাইবান্ধায় সেটি ৬৬.৮৭ শতাংশ। এসডিজিতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যে হারে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোভিড-১৯ এ অগ্রগতিকে আরও শ্লথ করে দিয়েছে।

চরাঞ্চলের জন্য পৃথক শিক্ষা ক্যালেন্ডার দরকার

জহুরুল কাইয়ুম জানান, প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয় না। মন্ত্রণালয় থেকে একেক সময় একেক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। এতে করে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে মোবাইল আর্থিক সেবায় ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অভিভাবকরা প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে অভিযোগ করছেন। এর সমগ্র দায়ভার চাপছে প্রধান শিক্ষকের ওপর। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনো সুরাহা করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বন্যা কবলিত অঞ্চল এবং চরাঞ্চালের জন্য পৃথক শিক্ষা ক্যালেন্ডার দরকার।

কোভিডের শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে উদ্যোগ প্রয়োজন

বক্তারা বলেন, কোভিড সময়কালে শিখন ক্ষতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখনও বিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। এক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়ে জহুরুল কাইয়ুম উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ১৬ মার্চ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেটি ২৫-৩০ শতাংশের বেশি কার্যকর হয়নি। গ্রামাঞ্চলে এটি প্রায় অকার্যকর ছিল। ২০২০ সালে পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হয়। ২০২১ সালে ওয়ার্ক শিটের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। এই দুই বছরে শিক্ষার বেশ ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, তার চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার স্তরটিও নেই। এর ফলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। শিখন ঘাটতির বিষয়ে এনসিটিবির গবেষণা থেকে জানা যায়, ইংরেজি শিক্ষায় ২০১৯ সালে শিখন মান ছিল ৪৮, যেটি করোনা-পরবর্তী ২০২২ সালে ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যান্য বিষয়ে শিখনের মান ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও শিখন ঘাটতির এ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। এই শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা বোধগম্য নয়। তিনি উল্লেখ করেন, করোনাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও খোলা ছিল মাদ্রাসা। ফলে অনেক শিক্ষার্থী মাদ্রাসাায় চলে গেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জরিপ চালিয়ে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কোভিডে যে শিখন ক্ষতি হয়েছে এবং শিক্ষার ওপর যে কোভিডের একটি প্রলম্বিত প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়টি বাজেটে একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি। কোভিডের ক্ষতি কীভাবে প্রশমন করা যায়, সে বিষয়ে বাজেটে নির্দেশনা থাকা উচিত।

নারী শিক্ষকদের জন্য ডে-কেয়ার সেবা চালুকরণ

আখতারুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এটি পরিকল্পিতভাবেই করা হয়েছে। এতে দোষের কিছু নেই। এখন এই নারী শিক্ষকদের নিজেদের ছোট শিশু রয়েছে। সেই শিশুদের নিয়েই তাদের বিদ্যালয়ে যেতে হয়। অনেক শিক্ষকের একাধিক সন্তান রয়েছে। এ অবস্থায় ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা না থাকলে ওই শিক্ষক পাঠদানে মনোযোগ দেবেন কীভাবে?

এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ডে কেয়ার সেন্টার একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। তবে প্রতিটি স্কুলে সেটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একটি অঞ্চলের কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এমনভাবে ডে কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে

সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র উল্লেখ করেন, শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক পেশা। কিন্তু যারা অতিমেধাবী তারা এ পেশায় আসতে চাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে মেধাবীরা অন্য পেশা ছেড়ে শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহী হন।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তবে শিক্ষকরা যাতে শিক্ষকতা করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যক্রম জোরদার করতে হবে

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি বলেন, সব বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর আছে। এই প্রজেক্টরে বাচ্চাদের কার্টুন দেখাতে হবে, নানা ধরনের শিক্ষা-সহায়ক উপাদান এতে তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। সরকারের উচিত ক্লাস লেকচার তৈরি করে স্কুলগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া। সেই ক্লাস লেকচার মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এটা করা হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের ঘাটতি থাকলেও শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা যায়। এক্ষেত্রে দেশের সেরা শিক্ষকের সেরা লেকচার রেকর্ড করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলে শিক্ষক সংকটে থাকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য তা সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সংসদ সদস্য বেশ কিছু বিষয়ে সুপারিশ করেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ সড়ক স্থাপন
২. চরাঞ্চলের জন্য ভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুকরণ
৩. খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকা
৪. বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল থাকা
৫. মাধ্যমিক স্তরের জন্য যেমন একটি প্রকৌশল ইউনিট আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তেমন একটি পৃথক প্রকৌশল ইউনিট করা

৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা কি সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়বে, নাকি তাদের জন্য তৈরি বিশেষ স্কুলে পড়বে, তাদের দেখাশুনার বিষয়টি কেমন হবে - এসব চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত একটি ইস্যু। কিন্তু এটি সমাধানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেই। এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
৭. কর্মকর্তাদের বদলির সাথে সাথে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার পরিবর্তন একটি বড় সমস্যা। এটির সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

উপসংহার

পরিশেষে সমাপনী বক্তব্যে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা জানি, দারিদ্র্য ও সাক্ষরতার হারসহ নানা ক্ষেত্রে এ অঞ্চল পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে প্রযুক্তি। মিশ্র শিখন পদ্ধতি সেটির একটি প্রয়োগ মাধ্যম হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক সুবিধার কাল-অতিক্রম করছে। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে এ সুযোগের জানালা আর থাকবে না। এই সুবিধা ভালোভাবে কাজে লাগাতে হলে শিশুদের ওপর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিশুদের জন্মের পর প্রথম কয়েক বছরে যদি আমরা তাদের উপযুক্ত পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পরবর্তী জীবনে অব্যাহত থাকবে। কাজেই একজন মানুষের পেছনে বিনিয়োগের দিক থেকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথম কয়েক বছরে তার পেছনে করা বিনিয়োগ। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের এ গুরুত্ব। তিনি জানান, ২০৪১ সালের মধ্যে সরকার অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। আজকের শিশুকে দিয়েই তার অভীষ্টের বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভাপতি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

প্রধান অতিথি
ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি
সদস্য, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মানিত অতিথি
জনাব আব্দুর রশিদ রেজা সরকার ডাবলু
মেয়র, সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা, গাইবান্ধা

সম্মানিত আলোচক
অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম
সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, গাইবান্ধা

জনাব আখতারুজ্জামান
সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

সমাপনী বক্তা
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net